আরবদের সিন্ধু জয়

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রিঃ) একশো বছরের মধ্যে আরবেরা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। অষ্টম শতকের আগে থেকেই বাণিজ্যের কারণে আরব বণিকগণ ভারতে যাতায়াত করত। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় আরবেরা বোম্বাইয়ের নিকট আসে। গুজরাটের ব্রোচ ও সিন্ধুর দেবল বন্দরে অভিযান পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়। ইরাকের শাসককর্তা হজ্জাদের সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবেরা সিন্ধুদেশ দখল করে। তবে এই জয়ের কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। ঐতিহাসিক লেনপুল আরবদের সিন্ধু বিজয়কে 'নিষ্ফল বিজয়' বলেছেন। এ অভিযান ভারতে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে নি। সিন্ধুদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এবং প্রতিহাররাজ নাগভট্টের ক্রমাগত আক্রমণে ভারতে ইসলাম শক্তির পতন ঘটে। সিন্ধুতে আরব শাসন বৃহত্তর ভারতের সমাজ, রাজনীতি বা সংস্কৃতির ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। বরং আরবীয় সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। তাছাড়া আরবদের মাধ্যমে ভারতের মহান সংস্কৃতি ইউরোপের দেশগুলিতে পৌঁছেছিল। আরবদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে এই দুই প্রাচীন সংস্কৃতির সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

Contd.2

• তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা :

তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতির অভাব ছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতের প্রধান শক্তিগুলি হল রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রকূট এবং বাংলায় পালরাজ্য কনৌজ-এর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এই তিনটি শক্তি এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে তুর্কি আক্রমণকারীরা ভারতে প্রবেশ করেছিল।

• সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ :

ভারতের অফুরন্ত ঐশ্বর্য ও রাজনৈতিক অনৈক্য আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর শাসকদের ভারতবর্ষ আক্রমণে উৎসাহিত করে। গজনীর সুলতান সবুক্তগীন দুবার ভারত আক্রমণ করেন। সুবক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ সিংহাসনে বসেই পিতার ন্যায় রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে মামুদ থানেশ্বরের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন এবং এখানকার বিখ্যাত চক্রস্বামী মন্দির লুঠ করে প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করেন। ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে মথুরা জয় করে মামুদ প্রচুর মন্দির ধ্বংস করেন এবং প্রভূত সম্পত্তি হস্তগত করেন। ১০২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে মামুদ কাথিয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দু-কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, ধর্মবিস্তার বা সাম্রাজ্য স্থাপন নয়, লুণ্ঠনই মামুদের ভারত অভিযানের লক্ষ্য ছিল। ডঃ স্মিথের মতে, ''মামুদ ছিলেন একজন বড়ো মাপের লুঠেরা মাত্র।'' যাই হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে, সুলতান মামুদই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পথ প্রদর্শক। মামুদের লুণ্ঠনের ফলে একদিকে যেমন ভারতের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি গজনী সমৃদ্ধশালী নগরীতে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মামুদকেই অনুসরণ করে মহম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

• মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ :

গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী ঘুর রাজ্যের অধিপতি মুইজুদ্দিন মহম্মদ-বিন সাম বা ইতিহাস বিখ্যাত মহম্মদ ঘুরী ছিলেন সুলতান মামুদের পরবর্তীকালে ভারতে মুসলমান আক্রমণের নায়ক। ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী গজনী দখল করে ভারত অভিযানের পরিকল্পনা করেন। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত আক্রমণ করেন এবং মূলতান, সিন্ধু, উচ, লাহোর ও পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১১৯১ খ্রিঃ আজমীরের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহান তাঁকে বাধা দেন। প্রথম তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত ঘুরী ভারত ত্যাগ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ঘুরী দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লি ও আজমীর দখল করে। মহম্মদ ঘুরী তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতীয় তুর্কী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গজনীতে ফিরে যান। কুতুবউদ্দিন গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর ও গুজরাট জয় করেন। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী আবার ভারতে আসে এবং কনৌজ দখল করেন। ঘুরীর আর এক অনুচর বক্তিয়ার খলজি বিহার ও বাংলাদেশে তুর্কি শাসন প্রবর্তন করেন (১২০৫-০৬ খ্রিঃ)। এইভাবে পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত তুর্কি অধিকার স্থাপিত হয়। মহম্মদ ঘুরী মামুদের মতো ধনরত্ন লুণ্ঠন না করে ভারতে স্থায়ী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ :

৬৪৭ খ্রি: হর্ষের মৃত্যুর পর [illegible] যে সময় শুরু হয়, তা থেকে [illegible] মহম্মদ গজনীর ভারত আক্রমণ পর্যন্ত, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না, এই সময় রাজপুত্রদের [illegible] উত্তর ভারতে [illegible] ছিল, [illegible] উত্তর ভারতের রাজনৈতিক [illegible] সর্বভারতীয় [illegible] রাষ্ট্রগুলোর [illegible] ছিল। সামন্ততান্ত্রিক [illegible] রাষ্ট্রগুলোর [illegible] হয়ে পড়ে, এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতে যে সময় হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে [illegible] সাম্রাজ্যের [illegible] এই সময় আরবদের [illegible] [illegible] করেছিলেন, এই সময় উত্তর ভারতের [illegible] রাষ্ট্র ছিল [illegible] (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা), প্রতিহারী কনৌজ এর মৌখরী রাজা (কনৌজ অঞ্চল), [illegible] এর [illegible] (উত্তর [illegible] অঞ্চল), এই তিনটি রাষ্ট্র [illegible] নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করতো, এই সময় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক [illegible] ছিল কনৌজ, ঐতিহাসিক [illegible] মনে করেন যে, কনৌজ অধিকার মানে সমগ্র [illegible] উত্তর ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতীক, পরবর্তীকালে দিল্লী [illegible] যেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়, [illegible] মগধের [illegible] বংশের সঙ্গে [illegible] [illegible] পূর্বদিকে [illegible] [illegible] অঞ্চল (যা বর্তমানে উড়িষ্যা বলে পরিচিত) অধিকার করে, [illegible] রাজার সঙ্গে [illegible] শুরু হয়, অন্যদিকে মৌখরী [illegible] সমর্থনে পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেন, ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের রাজ্য ছিল শেষ সাম্রাজ্য, ভারত উপমহাদেশের এক প্রধান ছিল এর অন্তর্ভুক্ত, হর্ষবর্ধনের সময় মালব ও রাজপুতনার অংশ বিশেষ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং আরবের [illegible] [illegible] [illegible] ছিল [illegible] বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাষ্ট্র।

কাশ্মীর: কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে হর্ষবর্ধনের কাশ্মীর স্বাধীন ছিল এবং কারকোট বংশ সেখানে রাজত্ব করত, এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ললিতাদিত্য, তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও যোদ্ধা, ললিতাদিত্য কনৌজ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন, নবম শতকের প্রথমার্ধে কারকোট বংশের পতন ঘটে এবং উৎপলা বংশের উত্থান ঘটে, এই রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন অবন্তীবর্মন (৮৫৫-৮৩), অবন্তীবর্মনের শংকরবর্মন রাজা হন, শংকরবর্মনের মৃত্যুর উৎপলা বংশের অবসান ঘটে এবং ৯৩৯ খ্রি: নাগাদ কাশ্মীরে

স্থানীয় মুসলমান বংশের প্রতিষ্ঠা হয়, দক্ষিণের শক্তিশালী আক্রমণকারী শাহমীর কাশ্মীর দখল করে এক নতুন রাজবংশের সূচনা করেন।

কনৌজ: হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যশোবর্মনের সময়ে (৭২৫-৫২ খ্রি.) কনৌজ রাজ্যের প্রতিপত্তি, সামরিক মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের সহায়তায় যশোবর্মন তিব্বত অভিযানে সাফল্য লাভ করেন, শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার (সংস্কৃত) ভবভূতি। * যশোবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের সময়ে কনৌজের মর্যাদা ও শক্তি বিনষ্ট হয় ** এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিহার রাজ নাগভট্ট কনৌজ অধিকার করেন। * (নীচে লেখা)

সিন্ধুদেশ: হর্ষবর্ধন সিন্ধুদেশ অধিকার করলেও তাঁর মৃত্যুর পর সপ্তম শতাব্দীতে চাচ নামক একজন ব্রাহ্মণ সেখানে এক রাজবংশ স্থাপন করেন। চাচের পর তাঁর ভাই চন্দ্র সিন্ধুদেশের রাজা হন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে চাচ পুত্র দাহির কে পরাজিত করে আরব সম্রাট হজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশিম সিন্ধুদেশ দখল করেন ও সেখানে আরব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

মালব: অষ্টম শতকে উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজ্য ছিল মালব, মালবের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, এখানে গুর্জরদের একটি শাখা প্রতিহার শাসন করতেন, প্রতিহার শাসকেরা মাড়ওয়াড় (যোধপুর), অবন্তী (উজ্জয়িনী) ও ব্রোচে রাজ্য স্থাপন করেন, ৭২৫ খ্রিস্টাব্দে আরব সেনাপতি জুনিয়াদ প্রতিহার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল বিধ্বস্ত করলেও প্রতিহার রাজ নাগভট্ট আরবদের বিতাড়িত করেন, নাগভট্টের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের সময়ে মালব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ: গুপ্তবংশের পতনের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়, হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর। অষ্টম শতকে কনৌজ রাজ ~~যশোবর্মন~~ যশোবর্মন বাংলা আক্রমণ করেন, বাংলাদেশে অরাজকতা নেমে আসে এবং অবশেষে বাংলার সামন্তরা গোপাল নামে এক সামন্তকে রাজপদে নির্বাচিত করেন, অষ্টম শতকের প্রথমদিকে গোপাল পালবংশ প্রতিষ্ঠা

*** কনৌজ: **** হর্ষবর্ধন কনৌজকে রাজধানী করায় তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল, পরবর্তীকালে কনৌজ 'মহোদয়শ্রী' নামে অভিহিত হয়, কনৌজ অধিকারকে কেন্দ্র করেই ভারতের উদীয়মান তিনটি রাষ্ট্রশক্তি — বাংলা-বিহারের পালগণ, মালব ও রাজপুতনার প্রতিহার গণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ প্রত্যেকে ~~[illegible]~~ ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধশালী কনৌজকে অধিকার করার জন্য এক সংগ্রামে লিপ্ত হয়, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সময়কার কনৌজের গুরুত্ব উল্লেখ করতে বলেছেন যে, টিউটনিক বর্বর জাতির কাছে রোম যেমন ছিল আকর্ষণীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার

বিদ্যমান জাতিগুলির কাছে ব্যাবিলন যেমন ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও ঈপ্সিত স্থান, সেইরূপ ছিল সমকালীন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে কনৌজের স্থান। কনৌজ কে কেন্দ্র করে ত্রিশক্তি সংগ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল প্রায় দুশো বছর। তারপর শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে প্রতিহারদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘকালের সংগ্রামের অবসান ঘটে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই প্রতিহার রাজবংশের উপর অন্ধকার অমানিশা নেমে আসে, অন্যদিকে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজবংশে রক্তপাত শুরু হয়, এবং দেবপালের মৃত্যুর পর পালশক্তির অবনতির সূচনা হয়, দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ যেমন ছিল দুর্বল, তেমনি ছিল অকর্মণ্য। ত্রিশক্তি সংগ্রামের ফলে রাষ্ট্রগুলির শক্তি যেমন একদিকে নিঃশেষ হয়েছিল, তেমনি উত্তর ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে মুসলমান শক্তির ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। সুলতান মামুদ ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করে, ত্রিলোচন পালকে পরাজিত করে কনৌজ বিধ্বস্ত করেন। সুলতান মামুদের পর মহম্মদ ঘুরী কনৌজ রাজ জয়চাঁদ কে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করার সাথে সাথে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, ইসলামের বিজয় ভারতবর্ষে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

□ **দাক্ষিণাত্য: বকাটক বংশ:** চতুর্থ শতকে দাক্ষিণাত্যে বকাটক ও পল্লব বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বকাটক বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বকাটক রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেন ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের উত্তরাধিকারীরা বহুদিন পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন।

□ **পল্লববংশ:** বকাটক রাজ্যের দক্ষিণে পল্লব রাজ্য ছিল। কাঞ্চী ছিল এর রাজধানী। পরাক্রমশালী সিংহবিষ্ণু ষষ্ঠ শতকে চোলরাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবর্গ ও সিংহলরাজকে পরাজিত করেন। এরপর বাতাপীর চালুক্য বংশের সঙ্গে পল্লব রাজবংশের দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে। শেষে বাতাপী-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পল্লব রাজ্য বিধ্বস্ত করে কাঞ্চী দখল করেন। এই সময়ে আরবরা সিন্ধুদেশে আধিপত্য বিস্তার করে, দাক্ষিণাত্যে

□ **সুদূর দাক্ষিণাত্য:** প্রাচীন কাল থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্য ভারতে তিনটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় — পান্ড্য, চোল ও চের বা কেরল রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। অবশেষে পরবর্তী কালে পল্লবরা এই তিনটি রাজ্যের বিপুল শক্তি অর্জন করে দক্ষিণ-ভারতে সার্বভৌম শক্তি স্থাপন করে।

রাজপুত রাজ্য সমূহ: অগ্নিকুল - হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব হয়, রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে চারটি রাজপুত গোষ্ঠী অগ্নিকুল হিসেবে নিজেদের দাবি করতো। এরা হল— প্রতিহার (পরিহার) চৌহান (চাহমান), সোলাঙ্কি এবং পরমার বংশ। প্রতিহার বংশ উত্তর-রাজস্থানে, কাথিয়াবাড়ে সোলাঙ্কি বংশ, মালবে পরমার এবং চৌহানরা দ্বিতীয় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। সোলাঙ্কি বংশীয় রাজা আনুমানিক ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে অনহিল-পাটকে স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। সোলাঙ্কি বংশের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন কর্ণ, ১২৯৭খ্রি: আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর কর্ণকে পরাজিত করে গুজরাটে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন।

খ্রিস্টীয় নবম শতকে উপেন্দ্র কৃষ্ণরাজ মালবে পরমার বংশের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রথমে পরমাররা কনৌজের প্রতিহার রাজাদের সামন্ত ছিলেন, দশম শতকের শেষদিকে এই বংশের দ্বিতীয় সিয়ক স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। পরমারদের সাথে সমসাময়িক চেদির কলচুরী, মহোবার চন্দেলা, গুজরাটের সোলাঙ্কি এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের যুদ্ধবিগ্রহ ছিল নিত্য ঘটনা। পরমার বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ভোজ (১০১০-'৬০খ্রি:)। ভোজের মৃত্যুর পর পরমার বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে এই রাজ্য তুর্কী-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বা শাকম্ভরীতে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে চৌহান বংশ। আজমীর ছিল সম্ভরের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। চৌহান বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দুর্লভ বিগ্রহরাজের নাম পাওয়া যায়। চৌহান বংশের সর্বাধিক কীর্তিমান শাসক হিসেবে পৃথ্বীরাজ চৌহান (১১৭৮-৯২খ্রি:)। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করলেও (১১৯১খ্রি:) পরের বছরই তিনি ঘুরীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

□ সূর্য বা চন্দ্রবংশোদ্ভূত আরো কতকগুলি রাজপুত গোষ্ঠী পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল, এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল বংশ এবং চেদীর কলচুরী বংশ। চন্দেলরা প্রথমে কনৌজের প্রতিহারদের সামন্ত হিসেবে এই অঞ্চল শাসন করতে থাকে। খ্রিস্টীয় নবম শতকের প্রথমদিকে নান্নুক চন্দেলা প্রথম স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন।

দিল্লীর নিকটবর্তী বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চলে ছিল রাজপুত তোমর বংশের শাসন। এরাও প্রথমে প্রতিহার দের সামন্ত ছিলেন, তোমররা ৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীকা শহর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইহাই দিল্লী নামে পরিচিত,

এই সময়ে কামরূপ বা আসামে একটি পার্বত্য রাজ্য গড়ে উঠেছিল, ড. আপাদের মতে "পূর্বভারতের মধ্যে তিব্বত ও চিনের বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবে কামরূপ ক্রমশঃ স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল।" ত্রয়োদশ শতকে শান উপজাতিভুক্ত অহোমরা কামরূপের অনেকাংশ দখল করে নেয়, পরবর্তীকালে এদের নামানুসারে এই অঞ্চল 'আসাম' নামে পরিচিত হয়।

নবম শতকে কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার অঞ্চলে "শাহীয়" নামে যে মুসলিম বংশ শাসন করত, তাঁদের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সেখানে ক্ষমতা দখল করে হিন্দুশাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন। উত্তর ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অ্যাটক অঞ্চলে এই শাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই বংশের জয়পাল পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন। এই জয়পালই প্রথম গজনীর সুলতানের আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর বাংলাতে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই একশো বছর ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় পাল বংশের শাসনের সূচনা হয় (৭৫০ খ্রি:), পাল বংশের পতনের পর বাংলায় একাধিক ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। যেমন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কম্বোজ; ঢাকা-ফরিদপুরে চন্দ্র; ত্রিপুরায় লৌহিত্য ইত্যাদি। এদের মধ্যে কম্বোজরাই কিছুটা শক্তির অধিকারী ছিল। ১১৬২ খ্রি: পালবংশীয় রাজা মদন পালকে পরাজিত করে সেন বংশীয় রাজা বিজয়সেন বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী বাংলা দখল করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

সুতরাং দেখা যায় ভারতে ইসলাম শক্তির আবির্ভাবের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের যথেষ্ট অভাব ছিল, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পারস্পরিক সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থেকে ভারতীয় সীমান্ত-রক্ষার ব্যাপারে একরূপ উদাসীন ছিলেন, সমগ্র ভারতব্যাপী কোন রাষ্ট্রীয় ধারণা সেই সময় ছিল না, দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ এবং এমন কি

* পরের অংশ টুকু Feb -09 Monday তে আছে.

সুলতান রিজিয়া (১২৩৬-৪০ খ্রি:)

□ ইলতুৎমিসের পুত্রেরা সিংহাসনে বসার অযোগ্য হওয়ায়, জীবিত কালেই ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রিজিয়াকে সুলতান রূপে মনোনীত করেন। সুলতানের এই মনোনয়ন অবশ্য তুর্কী অভিজাতদের মনঃপূত ছিল না, কারণ সিংহাসনে আসীন কোনো নারীর অধীনতা বা তাঁর অধীনে কাজ করতে তারা রাজী ছিলেন না, ফলে, অভিজাতদের অসন্তোষের সুযোগে রিজিয়ার পরিবর্তে ইলতুৎমিসের পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। রুকনউদ্দিন ছিলেন সম্রাট হিসাবে অযোগ্য, ব্যাভিচারী এবং দুর্বলচিত্ত শাসক, তাঁর অপশাসনে বিরক্ত হয়ে অভিজাতগণ শেষপর্যন্ত রিজিয়াকেই সুলতান রূপে স্বীকার করেন। কিন্তু মুলতান, বদাউন, লাহোর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তারা রিজিয়াকে সুলতান রূপে স্বীকার করে নিতে পারেন নি, ফলে তাঁরা সমবেত ভাবে রিজিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন, সামরিক দিক থেকে দুর্বল সুলতান রিজিয়া কূটনীতির সাহায্যে এদের পরাজিত করেন, এবং লক্ষ্মণাবতী থেকে দেবল পর্যন্ত এলাকা রিজিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে।

□ সুলতান রাজিয়া ছিলেন সর্বগুণ সম্পন্না। তিনি তুর্কী অভিজাত ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমন করে সর্বত্র স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মিনহাজ-উস-সিরাজের ভাষায় বলা যায়, "লক্ষ্মৌতি থেকে দেবল ও দামরিলা পর্যন্ত সকল মালিক ও আমীরগণ তাঁদের আনুগত্য ও বশ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন"। বিদ্রোহ দমনের পর রাজিয়া শাসন-সংগঠনের কাজে অগ্রসর হন।

□ রাজিয়া তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির ফলে খুব সহজেই সঙ্কট জনক অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিভা সম্পন্ন মহিলা, বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ Sunday 18 রিজিয়াকে তীক্ষ্ম কূটবুদ্ধি সম্পন্না, স্বাধীনচেতা দেশ প্রেমিকা ও বিদ্যানুরাগী হিসাবে অভিহিত করেছেন। দেশকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করে উন্নতর পথে হবার জন্য যে সমস্ত গুণের অধিকারী শাসককে হতে হয় সেই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন রাজিয়া, তিনি শাসন পরিচালনার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন, এবং স্বয়ং পুরুষের পোষাকে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সভার কাজ পরিচালনা করতেন। সুলতানা রাজিয়া অসাধারণ সাহসিকতা ও কূটকৌশলে বিদ্রোহী অভিজাত শ্রেণিকে দমন করেন। অযোধ্যার সামন্তরাজ নসরৎ উদ্দিন তায়াসির আসলে কেন্দ্রীয় শাসন অবমাননা করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজিয়াকে

* মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা [শেষাংশ]

সমবেত ভাবে বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধা প্রদান করার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সমসুকে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা কিছুটা পৃথক ছিল; কারণ প্রথম থেকে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশই ছিল জাতীয় রাষ্ট্র এবং জন সাধারণের সমর্থন পুষ্ট। কিন্তু উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই কারণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলিতে প্রস্তুতির অভাব ছিল এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল।

□ আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় ও আরব আক্রমণ সম্পর্কে তথ্যাদি : ইসলামধর্মীদের প্রাথমিক রাজ্য-বিজয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নেই, কিন্তু ভারতে তাদের আক্রমণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়, সন ও তারিখ অনেক ক্ষেত্রেই 'আল্-বিলাদুরি' ভুল থাকা সত্ত্বেও 'আল্-বিলাদুরি' থেকেই একমাত্র আরবদের ধারাবাহিক ভারত অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থটির ঘটনাবলির সত্যতা যাচাই করার জন্য 'আল্-তারি' ও 'ফুতুহ-উল-আকবর' গ্রন্থ দুটি বিশেষ সাহায্য করে। এছাড়া 'চচ্‌নামা' নামক গ্রন্থ থেকেও ভারতে আরবদের অভিযান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে মীর মহম্মদ মাসুদ কর্তৃক রচিত 'তারিখ-সিন্দ' ও আলিশের কানি রচিত 'তুহফাতুল-কিরাম' নামক গ্রন্থ দুটি থেকেও আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

□ আরব আক্রমণের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের অবস্থা : আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তম শতাব্দীতে রায় সাহসির পুত্র সাহিরাস নামে এক রাজা সিন্ধুদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য পূর্বে কাশ্মীর, পশ্চিমে মেকরান, দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে ও উত্তরে কিকানন্ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সিন্ধু রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল দেবল, রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল এবং বাকি অংশ চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার ছিল এক একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর।

* মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা [শেষাংশ]

সমবেত ভাবে বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধা প্রদান করার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সমসুরেত দক্ষিণ ভারতের অবস্থা কিছুটা পৃথক ছিল; কারণ প্রথম থেকে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশই ছিল জাতীয় রাষ্ট্র এবং জন সাধারণের সমর্থন পুষ্ট। কিন্তু উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই কারণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলিতে প্রস্তুতির অভাব ছিল এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল।

□ আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় ও আরব আক্রমণ সম্পর্কে তথ্যাদি: ইসলামধর্মীদের আমাত্রিক রাজ্য-বিজয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নেই, কিন্তু ভারতে তাদের আক্রমণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়, সন ও তারিখ অনেক ভুল ক্ষেত্রেই 'আল-বিলাদুরি' ভুল থাকা সত্ত্বেও 'আল-বিলাদুরি' থেকেই একমাত্র আরবদের ধারাবাহিক প্রকৃত অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থটির তথ্যাবলির সত্যতা যাচাই করার জন্য 'আল-তারি' ও 'ফুতুহাত-উল-আকবর' গ্রন্থ দুটি বিশেষ সাহায্য করে। এছাড়া 'চাচনামা' নামক গ্রন্থ থেকেও ভারতে আরবদের অভিযান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে মীর মহম্মদ মাসুম কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-সিন্দ' ও আলিমের কাব্যি রচিত 'তুহফাতুল-কিরাম' নামক গ্রন্থ দুটি থেকেও আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

□ আরব আক্রমণের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের অবস্থা: আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তম শতাব্দীতে রায় সাহসির পুত্র সাহিরস নামে এক রাজা সিন্ধুদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য পূর্বে কাশ্মীর, পশ্চিমে মেকরান, দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে ও উত্তরে কিকানন পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সিন্ধু রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল দেবল, রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল এবং আলোর নগরে তাঁর

ইয়ামিনি বা গজনীর সুলতান বংশ

আলপ্তগীন ৯৬২ খ্রি:

ইসহাক

বলকাতগীন

পিরাই ৯৭২-৯৭৭ খ্রি: (৯৭৭)

সবুক্তগীন ৯৭৭-৯৯৮ খ্রি:

সুলতান মাহমুদ ৯৯৮-১০৩০ খ্রি: | ইসমাইল।

রাজধানী অবস্থিত ছিল, তেমনি রাজ্যের অবশিষ্টাংশ [illegible] চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি প্রদেশের রাজধানী ছিল — **ব্রাহ্মণাবাদ, সিউস্তান, ইস্কান্দা ও মুলতান।** রাজা সাহিরস্ পারস্যবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রায় সাহসি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে চাচ নামে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন এবং প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন দখল করেন ও দ্বিতীয় রায় সাহসির বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন। চাচের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে পুত্রদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে চাচের পুত্র দাহির সিংহাসন দখল করেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। প্রথমদিকে সিন্ধু রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, তবে কিন্তু সপ্তম শতকে এই রাজ্যের সংহতি ও শান্তি বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়, অভ্যন্তরীণ অরাজকতা, প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের অত্যাচার ও দুর্বল রাজশক্তি প্রভৃতি কারণে সিন্ধুরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এক প্রকার ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। রাজ্যের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মত মোটেই উপযুক্ত ছিল না।

সিন্ধুরাজ্যের দুর্বলতার কারণ: (১) চাচ্ কর্তৃক বলপূর্বক সিংহাসন দখল ও প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ; (২) দাহির ও তাঁর ভাই দাহারসিয়া-র মধ্যে রাজ্য বন্টন - রাজ্যের আর্থিক সম্পত্তি বিনষ্ট করেছিল; (৩) কাশ্মীর, কনৌজ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে সিন্ধুরাজাদের অহিত-কর- বিসম্বাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ সিন্ধুরাজ্যের সামরিক শক্তি বিনষ্ট করে; (৪) বৌদ্ধ ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ এবং নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অত্যাচারে সিন্ধুরাজ্যে সামাজিক অশান্তি দেখা দেয়, এবং (৫) ইসলামী আক্রমণকারীদের কাছে বৌদ্ধদের আত্মসমর্পণ ও তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন আরবদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আরবদের রাজ্যবিস্তার: ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের দেহত্যাগের (৬৩২ খ্রি:) সময় কাল পর্যন্ত আরবদের আধিপত্য আরব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর এক শতাব্দীর মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবদেশের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে, মহম্মদের দেহত্যাগের মাত্র ছয় বছরের মধ্যে আরবেরা সিরিয়া ও মিশর অঞ্চল দখল করে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কালে খলিফারা তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে পূর্বে পারস্য থেকে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত বিশাল এলাকা দখল করে, দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য ও প্রভূত সম্পদের কথা আরবদের অজানা ছিল না, পশ্চিম ভারতে চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে (৬৩৭ খ্রি:) থানা নামক অঞ্চলে মুসলিম আক্রমণ ঘটে। মুসলিম আক্রমণকারীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে